নানা রঙে দুর্গোৎসব

লেখিকাঃ সৌম্যশ্রী চক্রবর্ত্তী
যোগাযোগঃ soumyasree1982@gmail.com
পরিচিতিঃ অনেক ছোট বয়সে কোলকাতার The Statesman সংবাদপত্রের school supplement "Voices" থেকে যাত্রা শুরু সৌম্যশ্রীর; অগ্রগণ্য সংবাদপত্র The Statesman, The Telegraph, The Asian Age, The Hindustan Times (কোলকাতা সংস্করণ), The Times of India (কোলকাতা ও পুণা সংস্করণ), এবং ওয়েব-পত্রিকা 'পালকি'র জন্য প্রচুর freelancing করেছেন। সম্প্রতি chillibreeze.com–এর preferred লেখকদের তালিকাভুক্ত হয়ে content লিখছেন। CRY–এর যুব বিভাগ এবং Mentaid-এর সাথে বাচ্চাদের জন্য কাজ করেছেন তিনি। পছন্দ করেন বিভিন্ন রকম রান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করতে।

"বাজে ওই আগমনী গান
ঝড়ে শেফালী দোলে কাশের গুচ্ছ
মধুর বায়ে হল উতলা পরাণ"

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ হলেও ছেলেবেলায় যে দুটি উৎসবে সবচেয়ে বেশী আনন্দ হত তা হল দুর্গা পুজো ও সরস্বতী পুজো। কারণ ও দুটি সময় পড়াশুনো থেকে ছুটি মিলত। আর এ-দুটির মধ্যে দুর্গা পুজোটা বেশী পছন্দের কারণ এ সময় কলকাতার স্কুল কলেজগুলিতে থাকত লম্বা ছুটি। অফিস-কাছারিতেও পুজোর কদিন ছুটি পাওয়া যেত। দুর্গোৎসবের আসল হৈচৈ মহালয়ায় শুরু হয়ে দশমীতে শেষ হলেও তার রেশ চলত লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো ছাড়িয়ে ভাইফোঁটা পর্যন্ত। নানান আনন্দ উৎসবে ভরে থাকত গোটা একটা মাস।

দুর্গাপুজো এসে গেছে – এটা প্রথম মনে হত শারদীয়া পত্রিকাগুলি হাতে পেয়ে। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ওগুলিকে বেশী সময় দেওয়া যেত না বলে অপেক্ষা করে থাকতাম পুজোর দিনগুলির জন্য - অবকাশে উপভোগ করব বলে। নিজে যখন একটু আধটু লেখালেখির সুযোগ পেলাম তখন জানলাম কত মাস ধরে চলে পুজো উপলক্ষ্যে পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা ও বিপুল কর্মকাণ্ড। ছোটবেলায় অবশ্য অতকিছু গভীরে ভাবিনি কখনো - তখন ওগুলো হাতে পাওয়াতেই ছিল তৃপ্তি।

তারো আগে থেকে অবশ্য মায়ের সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পুজোর বাজার, খবরের কাগজে নজর রাখা কোন দোকানে কোনটা নতুন। Cousin ও বন্ধুদের মধ্যে জটলা - কে কি কিনল বা কিনতে চায়। কাছাকাছি থাকলে পরস্পরের বাজার দেখাটাও ছিল আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অংশ। বাড়ীর লোক, আত্মীয়-বন্ধু, বাড়ীর কাজের লোকগুলি - সবার জন্য বরাদ্দ প্রীতি উপহার। তখন বাজার করাটাতেই আনন্দ ছিল। এখন বুঝি, মা'কে কত হিসেব করে কত কিছু মাথায় রেখে সাধ্যের মধ্যে সবার সাধ মেটাতে হত। ঠাকুমা-দিদিমা-পিসি-কাকা-মামা - সবাই দিয়েছেন তাঁদের আশীর্বাদী উপহার। সব মিলিয়ে কত্তো নতুন জামা! কোনটা কোনদিন কোনবেলা গায়ে উঠবে তার কত্তো জল্পনা কল্পনা। মা সাজগোজ পছন্দ করেন। তাই নতুন জামার সঙ্গে মানানসই আনুষঙ্গিক টুকিটাকির জন্য হানা দেওয়া হত গড়িয়াহাটে অথবা নিউ মার্কেটে। সেই সঙ্গে মা কিনে নিতেন বাড়ীর জন্য নতুন বেডকভার, বালিশের কভার, তোয়ালে, পাপোশ প্রভৃতি। বাবা কিনে দিতেন নতুন জুতো। বাবার নিজের নতুন জুতোর প্রতি আকর্ষণ থাকায় আমাদের প্রায়-ই একাধিক নতুন জুতো কেনা হয়ে যেত। ঠাকুর দেখার সময় নতুন জুতো পরে হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পরলেও সেটাকে বিশেষ পাত্তা দিতাম না!

ঠাকুমা দিদিমা কে দেখতাম শুকনো খাবার বানিয়ে বয়ামে তুলে রাখছেন বিজয়ার পর আতিথি আপ্যায়ণের জন্য। অতিথিকে দোকানের কেনা খাবারে আপ্যায়িত করাটা তাঁদের কখন-ই আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই মন দিয়ে

বানাতেন নিম্‌কি, গজা, নাড়ু – এরম হরেক রকম এমন খাবার যা বহুদিন টাট্‌কা থাকে। ভালবাসা মমতা দিয়ে বানানো সে খাবারের স্বাদ-ই আলাদা!

এখন খুব কম বাড়ীতেই দুর্গাপুজো হয়। তাই পাড়ার ছেলেরা বারোয়ারি পুজো নিয়েই মেতে ওঠে। চাঁদা তোলা, ঠাকুর আনা, মিস্ত্রি কাজ করানোর সঙ্গে সঙ্গে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া। গলির মোড়ের মাঠে ম্যারাপ বাঁধা শুরু হলে আমাদের দিন গোনা শুরু হয়ে যেত। রোজ সকালে বারান্দায় গিয়ে দেখতাম কাজ কত-টা এগোল। খোলা বারন্দার ওপর নীল শরতের আকাশ, মিঠে সোনা রোদ, মৃদু ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া – সব মিলিয়ে মনে হত প্রকৃতিও যেন সেজে উঠছে উৎসবের সাজে। কুমোরটুলীর আশপাশ দিয়ে কোথাও গেলে দেখা যেত প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। শহুরে কলকাতায় কাশফুলের দোল বিশেষ দেখতে না পাওয়া গেলেও উঠোনের শিউলি গাছ তলা ফুলে ফুলে ঢেকে যেত। শিউলি ফুলের মাতোয়ারা গন্ধ আসত হাওয়ার সঙ্গে। দাদু বলতেন – পারিজাত – স্বর্গের ফুল।

মহালয়ার পনের দিন আগে থেকে মহালয়া পর্যন্ত চলত বাবার তর্পণ – পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। মহালয়ার ভোরে যখন রেডিওতে বেজে উঠত “মহিষাসুরমর্দিনী” কিংবা টেলিভিশনে প্রচারিত হত নানান আগমনী গান বা অনুষ্ঠান, তখন পুজোর উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা প্রভৃতি কাজের বেগ বেড়ে যেত। মা ততদিনে কাজের মেয়েটির সাহায্যে বাড়ী ঝেড়ে মুছে তক্‌তকে করে ফেলেছেন। ষষ্ঠীর দিন বের করবেন নতুন কেনা চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি। পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কার্ড এসে যেত বাড়ীতে। নতুন জামাগুলো ইস্ত্রি করাও হয়ে যেত। মন-ও উড়ু-উড়ু।

ষষ্ঠীতে ঢাকে কাঠি পড়লে আর পায় কে! অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করাই আছে – কবে বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঠাকুর দেখব, কবে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করব। প্রবীণেরা অবশ্য ভিড় এড়াতে বাড়ী বসে টেলিভিশনে “পুজো পরিক্রমা” দেখতে বেশী পছন্দ করতেন। প্রতি বছর-ই ঠাকুর দেখতে ভিড় করে প্রতিমার পাশাপাশি নজর কাড়ত মণ্ডপসজ্জা, আলোর রোশনাই। তাক্‌ লাগানো সব শিল্পকর্ম। কত সৃজনশীল মানুষের মিলিত পরিশ্রমের ফসল – সব-ই শুধু পাঁচদিনের জন্য। মনে হত সারা শহর জুড়ে যেন বিশাল এক মেলা বসেছে।

এ সময়ে বাড়ী থেকে রাস্তার স্টলের ফুচ্‌কা, এগরোল, ভেল, চাট কিংবা ভাজাভুজি খাওয়া নিয়ে নিষেধাজ্ঞা গুলো একটু শিথিল করে দেওয়ায় হাত খরচার অনেকটাই সে সবের পেছনে বয়ে যেত। ষষ্ঠীর বোধন, সপ্তমীর “নব পত্রিকা”, অষ্টমীর অঞ্জলী ও সন্ধিপূজা, নবমী সন্ধ্যের ধুনুচি নাচ, দশমীর ঠাকুর বরণ সিঁদুর খেলা – এ সবের ফাঁকে সময়কে যেন ধরে রাখা দায়! ঢাক, ঘন্টা, কাঁশী, শাঁখ এসবের আওয়াজে গমগম করা দিনগুলি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যেত। “দশমীতে হঠাৎ কেন আকুল হল প্রাণ, প্রাণ প্রতিমা তুমি এবার যাবে কি ভাসান”!

ঠাকুমা বলতেন দুর্গাপুজো হল মেয়ের বিয়ের মত – কত আয়োজন, কত উৎসাহ, তারপর বিদায়ের পর সব ফাঁকা। তাই-ই বোধ করি ঢাকে বোল বাজে – “ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন”। বিজয়া উপলক্ষ্যে বড়দের প্রণাম করা, সবাইকে শুভেচ্ছা জানানো, মিষ্টিমুখ, খাওয়াদাওয়া, আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ী যাওয়া – সব কিছুর ওপর ছাপিয়ে উঠত মনের আকুল আকুতি – “আসছে বছর আবার হবে”।

বিয়ের পর ভাবলাম দুই বাড়ীর আপনজনেরা মিলে পুজোয় প্রচুর আনন্দ করা যাবে। কিন্তু পুজোর বহু আগেই স্বামীর কর্মসূত্রে আমেরিকা এলাম। শাশুড়ি, মা স্যুটকেস ভরে দিলেন নতুন কাপড়-জামায় – প্রতি উৎসবের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম যে এখানে নাকি খুব ঘটা করে weekend এ দুর্গাপুজো হয়! তিথি মানা নির্ঘণ্ট নয়, মানুষের নিজের সুবিধে মত সময় করে নিয়ে হৈচৈ করা। বরাদ্দ শুধু একটি শনি ও রবি। তার মধ্যেই ষষ্ঠী থেকে দশমীর “complete package”। সময় এখানে বহুমূল্য, সবার ভীষণ কাজ। পুজো হয় স্কুল-কলেজের ‘হল’ বা মাঠ ভাড়া করে। তাই মণ্ডপসজ্জা, মাইকে গান, বা আলোর রোশনাই-এর ঘনঘটা এখানে ততটা চোখে পরে না। বিসর্জনের

মিছিলের উদ্দীপনা এখানে চিন্তার বাইরে। এমনকি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এক-ই প্রতিমায় বছরের পর বছর পুজো হয়। এখানে সব-ই শৃঙ্খলা মেনে মেপে ঝুপে আয়োজন করা। শোনা যায়না হাজার লোকের ব্যস্ত হাঁকডাঁক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখানেও হয়। কলকাতা-বম্বে থেকে শিল্পীরা আসেন। কিন্তু তাতে পাড়ার চেনা মুখের ঢল নামা ভীড় থাকেনা, স্মিত হাসির অভিবাদন থাকেনা। 'box lunch'-এ খিচুরি ভোগ সহজলভ্য, কিন্তু হারিয়ে গেছে পংক্তিভোজের হুল্লোড় আনন্দ। শুনতে পাই কোথাও কোথাও নাকি অঞ্জলির মন্ত্র 'generation X'-এর সুবিধার্থে ইংরাজিতে অনুবাদ করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে নিজের পরিবারকে ফোনে বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতে। প্রণাম, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ, বিজয়ার কোলাকুলি – এ সব তো আর 'long distance'-এ করা যায়না! এখানে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মিলে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করেন। খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড় হয় কোন এক weekend-এ। potluck dinner বা lunch-এ অনেক রকমারি menu থাকে।

থাকেনা মায়ের হাতের একেক বেলার একেকরকম পুজোর খাবার। নেই বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখার সময় মোবাইলে বাবার চিন্তিত ফোন, 'কিরে, কখন ফিরবি?', নেই ভাই-এর সঙ্গে শারদীয়া পত্রিকাগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি। নেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুমার সঙ্গে ভাসানের মিছিল দেখা। তাই হয়ত পুজোর weekend-এর উদ্দাম হুল্লোড়ের মধ্যেও –

"স্মৃতি বালুচরে
মুখেরা ভিড় করে"।